প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭
প্রকাশক : অমল সাহা

সৃষ্টি প্রকাশন : ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯।

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

মুদ্রক : দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন কলকাতা-৭০০ ০০৬

'সৃষ্টি'র কথা

উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় বইয়ের শতক। বিংশ শতাব্দীর গর্ব, তা নাকি ফিল্মের, আর একবিংশ শতাব্দী পূর্বচিহ্নিত হয়ে রয়েছে টেলিভিশনের জন্য। এই বাতাবরণে দাঁড়িয়ে একটা কথা এখন প্রায় স্লোগানে দাঁড়িয়ে গিয়েছে— বই আর কেউ পড়তে চায় না। ওটা সেকেলে অভ্যেস। বই পড়ুন, বই পড়ান— পোস্টার নিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের পদযাত্রা সেই ভাবনাকেই আরও উসকে দেয়।

আমরা কিন্তু এই ভাবনার শরিক নই। আমরা বিশ্বাস করি, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার আগুনে পুড়তে পুড়তেও ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে থাকবে, ডানা মেলে আকাশে উড়বে এবং দিগন্তের মৃত্তিকা স্পর্শ করবে বই। বিদেশে গ্রন্থপাঠের সাম্প্রতিক প্রবণতা আমাদের বিশ্বাসকেই বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করে। এই চিন্তা থেকেই জন্ম সৃষ্টি প্রকাশনের— সৃষ্টি পরিবারের প্রথম সন্তান। জন্মলগ্নেই যে শুনেছে প্রকাশকের কান্না, চোখ খুলেই যে অনুভব করেছে লেখকের হাহাকার। জ্ঞান হওয়ার আগেই যার মনে হয়েছে বাংলা প্রকাশন আজ মুমূর্ষু শিল্পের অন্তর্গত।

অথচ এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। বাংলা ভাষায় সাহিত্যসেবীরা যে বিশ্ববন্দিত সে কথা আজ আর অজানা নয়। সেই সুমহান ঐতিহ্যকে মাথায় রেখেই সৃষ্টি প্রকাশন তাদের কাজ শুরু করেছে। আমাদের ব্রত বাংলা প্রকাশনা জগতের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা। আমরা বিশ্বাস করি, যে জমি একদা সুফলা ছিল তা কখনও বন্ধ্যা হতে পারে না। দরকার যুগোপযোগী সার দিয়ে তাকে উর্বর করে তোলা, যাতে নবীন-প্রবীণ লেখকেরা শুধু তাঁদের সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে লেখার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। বাকি দায়িত্ব তো আমাদের। আমরা মনে করি, বাংলা বইয়ের পাঠক ছিল, আছে, থাকবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি যাতে বাংলা প্রকাশনা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে।

সূচিপত্র

কবিতা উৎসবে

কবিতা উৎসবে এসে একজন কবি
ভুলে যায় নিজের কবিতা ;
অক্ষরের সঙ্গে সব বোঝাপড়া ফেলে
হাঁটে অন্ধকারে, যেন অন্ধেরই ছবি তা।

অথচ প্রস্তুতি ছিল, ছিল উদ্‌যাপন
অভিজ্ঞাশালীন সব বোধ,
শব্দ যা চেনায় তার উজ্জীবনে পাওয়া
মৃত্যুর মতন প্রতিশোধ।

এখন কাঁপছে শিরা অন্য ভাষা শুনে—
কবিতা কি সত্যিই এমন !
তা হলে তরুণ কবি রক্ত পাক আরও,
থাকব আমি শুধুই শ্রমণ।

ক্রমশ অর্জিত বর্ম ছেড়ে অন্ধকারে
কবি মগ্ন শ্রোতার আসনে—
হায়, তার ভিক্ষুকের অনুভব ছুঁয়ে
কবিতাই জমছে মননে !

স্তব্ধতার মানে

ওই ওখানে দাড়িয়ে আছে মেয়েটি
রংচটা টেলিফোন-বুথের পাশে উদাসীন
পরনের হলদে-সবুজ শাড়িতে কিছু-বা ম্লান
সূর্যাস্তের আগের আলোয় তার ক্লান্ত চোখ
খুঁজছে এমন-কিছু যা সৌন্দর্য নয়
হলেও হতে পারে প্রতীক্ষার অবসান কিংবা
কথা-ফুরিয়ে-যাওয়া শরীরের
শেষ সম্ভাবনা।

দখল-মুক্ত কলকাতার ফুটপাথে দাঁড়ানো এই দৃশ্য
কেউ দেখছে , কেউ দেখছে না,কেউ বা
আড়ে তাকিয়ে তার আঁচলে লুকানো স্তনদুটিতে
আকার ফোটাতে-ফোটাতে হেঁটে যাচ্ছে দ্রুত
যত দ্রুত হেঁটে গেলে সে হয়ে উঠতে পারে
মুক্তাঞ্চলেরই অংশ, একটি গাছ কিংবা খেউড়!

কেউ জানে না গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে অস্থির কলকাতায়
তার এই স্তব্ধতার মানে কী!

সুতরাং

নামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে নাম
লাল কালিতে বিবাহবন্ধনী;
মালাবদল হবার ঠিক আগে
বিস্ফোরণে অবাধ হলো খনি।

জবর খবর : এমন কি আর দূর
ঘণ্টা দেড়েক লোকালে চড়ে গেলে
বলবে সবাই আগের শ্বশুরঘর—
মাসখানেকেই সিঁদুর গেছে ফেলে।

যে-হাত মালা পরাবে সেই হাতে
ক্রমশ তাপ ছড়ালো মজ্জায়,
সিঁদুর পরার কুনকো লাথির ঘায়ে
চিনিয়ে দিল সিঁথির অন্তরায়।

যুবতী কাকে বলবে সেসব কথা,
ব্লাউজ খুলে দেখাবে সেই দাগ—
বিয়ের পরেই সাত পুরুষের মোহে
দ্রৌপদীকেও ছাড়িয়ে যাওয়া ভাগ !

সুতরাং সে কারণ হয়েই থাকে—
জলেই চেনে জলের স্তব্ধতাকে।

স্বাধীনতা শব্দ চিনে

মৃতের মতন মুখ কার ভালবাসা পেয়ে এতটা এসেছ!
যেন মুখ মুখ নয়, নিজেকে চেনাও শুধু একদা শিরায়
চলাচল ছিল রক্ত, ছিল ঘাম, ছিল সম্ভাবনা——
স্মৃতি কি ওড়ায় আজও শৈশবের রঙিন পতাকা?

স্বাধীনতা শব্দ চিনে আর কতদিন তুমি ভাঙবে পাহাড়।
একই মেঘ বৃষ্টি দেয়, একই শস্য কেড়ে নিয়ে যায়
বিভিন্ন পোশাকে যারা বলেছিল নির্ভয়ে থাকো।

বুকের ভিতর শোক ভেঙে আর বেলুন উড়িয়ে
ক্রমশ আকাশচারী হতে হতে তারাই শেখায়
মৃতের মতন মুখ কোটি কোটি মানুষের, একই ইতিহাসে
তুমি একা কেন হবে একা!

বাড়িতে পুরুষ নেই

যে যাকে দেখছে তার দেখা শেষ হয় সর্বনাশে।

স্থিরমুখ অন্ধকার, পর্দায় পড়ে না কারও ছায়া;
এখানে রাজার স্পর্শ দীর্ণ করে নন্দিনীর মায়া—
মঞ্চ ভেঙে পড়ে, ভাঙা মঞ্চের আড়ালে কেউ হাসে।

যারা সমবেত তারা এই দৃশ্য দ্যাখেনি জীবনে।
অক্ষরের পাশে মূক বসে থেকে অক্ষর সাজায়;
জন্মের আগেই এই পাণ্ডুলিপি বীজ খুঁটে খায়—

নারী ও পুরুষ কথা এইভাবে জমে প্রহসনে।

তবুও অদর্শন বাজে বুকে, বুকে বড় বাজে।
একটি অদেখা স্বপ্ন হাওয়ায় ওড়নার মতো ওড়ে ;
এ কার লজ্জাবস্ত্র! একার আগুনে একা পোড়ে!

বাড়িতে পুরুষ নেই, মেয়েরাও বেরিয়েছে কাজে।

ধারাবাহিক

সেই গল্পটা মনে আছে?
সেই যে সেবার
ছোটবউ গর্ভবতী হয়েছে শুনেই
শাশুড়ি বললেন রেগে—
বড় বউমা, তুমি এত অসাবধান কেন!
চাবির গোছাটা ফেলে রেখেছ ওখানে!

খাঁচার ময়নাটিকে ছোলা দিতে গিয়ে
শুকনো মুখে বড়বউ দেখল তার ডানা ঝাপটানো
আর থেকে-থেকে ডাকা—
বড়বউ, হও সাবধান।

কলম কখনও বন্ধ্যা হয় না এখানে।

আমার আগেও এই গল্পটা লিখেছে অনেকে—
আমার পরের কেউ লেখবার আগে
আমি লিখলাম—
যাতে ধারাবাহিকতা থাকে, নষ্ট না হয়।

গান্ধারী, তুমিই সেই

কিছু কি দরকার ছিল অন্ধতায় অন্ধ হয়ে যাওয়া!

মহাকাব্যের শর্ত তোমাকে সাজিয়েছিল দার্শনিক ক্লীবে
শুধুই দেখাতে তুমি কতটা বশ্য ছিলে, কতখানি স্বামী-অনুগত!

কোথায় নারীর রক্ত! জরায়ু উন্মুখ রেখে যোনিপথ করেছ সুগম
যাতে স্ফীত হয় গর্ভ আর জন্ম নিতে থাকে কলুষে কুলীন
একটি একটি করে বিষচক্ষু শতপুত্র যারা একদিন
সম্যক চেনাবে মহাভারতের সব কথা নয় কিছু অমৃতসমান—

গান্ধারী, তুমিই সেই, অপ্রয়োজনে যার প্রয়োজন বাস্তব হারায়।

মেয়েটি ছেলেটি

বেড়াতে এসেছে ওরা, মেয়েটি ছেলেটি—
বেলাবেলি ট্রেনে চড়ে যাতে প্রেম বহুদূর হয়।
যেমন ছবিতে হয়, গল্প বা উপন্যাসেও;
কিছু কিছু দেখা আছে, অল্প কিছু আছে পড়ে ফেলা।
লেকে যাবে, নাকি সোজা ভিক্টোরিয়ায়?
না, না, সে অনেক দূর, তা ছাড়া হঠাৎ কিছু হলে!

নিঃশব্দ শব্দের মধ্যে ছেলেটি সাহসী হতে চায়—
মেয়েটি কুঁকড়ে থাকে, প্রেমিক দু হাতে নিক তুলে
যাতে তার সশরীর ভাষা পেয়ে ভুলে যায় ভয়।
শহরতলির ট্রেন ওদের হদিস পেয়ে ছুড়ে দেয় শহুরে স্টেশনে—
সামনে ওভারব্রিজ, সেখানে দাঁড়িয়ে ওরা ভাবে ফিরে যাবে;
কেমন-কেমন যেন চারপাশ; গায়ে-গায়ে, তবু স্বপ্ন নয়।

তবু কোনদিকে যাবে জেনে নেয়। তখন বিকেল
হবো হবো করছে, রোদ ছায়ায় ছায়ায় মিশে পড়ছে ঝিমিয়ে—
ওরা জেনে নেয় ঠিক কোনদিকে গেলে প্রেম বহুদূর হবে ;
যেমন ছবিতে হয়, গল্প কিংবা গল্প নয় এমন কিছুতে।
জলের সামনে বসে, জলের কিনারে যারা প্রেম-প্রেম খেলে
তাদের অন্ধকারে মিশে গিয়ে ভুলে যায় ফিরবে কখন।

মেয়েটি ছেলেটি ওরা, মেয়েটি ছেলেটি আর মেয়েটি ছেলেটি—
কোন মেয়ে কোন ছেলে, কে চেনাবে কতদূর গেলে প্রেম হয়,
কতখানি প্রেম হলে অন্ধকার চিনে নেয় স্বপ্নের ভিতর চুরমার
কিছু দৃশ্য দিয়ে আঁকা, কিছু বা দৃশ্য নয়, ছুরিছোরা পেশিতে সবল!

জলও নেয় না যাকে দিনের আলোয় ভাসা সেই লাশ যার
সে যদি ছেলেটি হয়, খবর কী করে জানবে তার সঙ্গে মেয়েটিও ছিল!

পাঁচটি আঙুল

কুষ্ঠরোগীর হাত হঠাৎ চিনিয়ে দেয় ওই মঞ্চে পাঁচটি আঙুল
স্পর্শ খুঁজেছিল আর ভালবাসা, ব্যর্থতায় অস্ত্র তুলেছিল একদিন;
যে দেয়, দিতেই পারে, তার কাছে সকৃতজ্ঞ ধরেছিল ফুল—
এবং অভিজ্ঞতা খুঁজে পেয়ে ভেবেছিল ভাষা শিখে লিখবে জীবনী।

আক্রান্ত হবার আগে কখনও কি ভেবেছিল আংটিরও ছবি থাকা ভালো,
নিদেন সম্মত এক হ্যান্ডশেক যে চেনাবে এই জন্মে হয়েছিল দেখা!
আঙুল একদা হয় মোমবাতি, আলো নয়, অযন্ত্রণা, শুধু গলে যাওয়া—
তারপরও অভিজ্ঞতা—চেনা জিব, চেনা জল, জীবনানন্দীয় হাইড্রান্ট!

এখন কিছুই নেই

চাই শব্দটি আর খোঁজে না আমাকে।
হাওয়ায় আমন গন্ধ চেনায় ভাতের দিন এসে গেছে কাছে
আমি থালা পেতে বসি, দেখি ক্ষুধা অর্থের আড়ালে
ক্রমশই খুলে নেয় পাকস্থলি, নালি, আগ্রহ।
ক্ষুধাও কি শব্দ শুধু! আমাদের দেখা হয়েছিল!

মানুষের ঘরবাড়ি জন্মদানের শেষে ঘুমিয়ে পড়েছে।
ঘুম তো বাহুল্য নয়, প্রয়োজন, এই কথা বলে যারা গিয়েছিল স্নানে
তাদের স্নেহের হাতে পেতে রাখা বিছানায় জেগে উঠি রোজ—
অন্ধকার শুয়ে থাকে অন্ধকারে, নিকটে বা দূরের ঘড়িতে
সময় শব্দ ছোঁয়, ঘুমও প্রয়োজন তারা কেন বলেছিল!

এই জেগে থাকা, চাই শব্দের অভাব চিনে অক্ষরে তাকিয়ে
বইয়ের ঘনিষ্ঠ পাতা পার হয়ে দেখি এক টুকরো প্রজাপতি
ইনিয়েবিনিয়ে মৃত কখন সামনে থেকে চলে গেছে দূরে
যাতে প্রয়োজন নেই তেমন দূরত্বে এক আরোগ্য চেনাতে—
আজও তারা ওড়ে আর উড়ে উড়ে চলে যায় শূন্যতা পেরিয়ে।

চাই শব্দটি আর সেইভাবে খোঁজে না আমাকে।
আমিও কি খুঁজি তাকে সমস্ত সহন করে একদা যেমন—
চাওয়ায় কি থাকে কিছু, কিংবা ক্ষুধায়, রাতঘুমে!
প্রেম, স্নেহ, তিক্ততার নিকট বৃত্ত থেকে আরও একটু দূরে গিয়ে ভাবি
চাওয়ায় কী ছিল তবে! এখন কিছুই নেই, শুধু মৃত্যু আছে ছায়া পেতে।

কালো বৃষ্টি

পোখরান বাস্তব হলে নিশ্চিত অনেকে মারা যাবে।
পরমাণু শব্দে খুব জোর আছে, বিস্ফোরণে আরও,
সুতরাং রাজনীতি প্রতিবাদ বুদ্ধিজীবী সভা আয়োজন
পোখরান বিষয়ে কিছু শব্দ লেখো যত দ্রুত পারো
ইস্যুটা গরম থাকতে হোক তার ব্যাপ্ত বিপণন;
বিষয় বিবেক—যারা বিবেকী তারাই এটা খাবে।

আমি ইতিহাসে ঢুকে খুঁজি সেইসব শব্দ যা ঠিক চেনাবে
হিরোশিমা নাগাসাকি কালো বৃষ্টি ধ্বংস সম্ভাবনা।
কিন্তু কোথায় তারা! পরিবর্তে ভীষণ জ্বালায়
চারপাশের প্রতিদিন, দারিদ্র্যরেখার নীচে শুয়ে যারা খেয়ে ও না খেয়ে
পোখরান চিনেছে আর চিনছে প্রত্যেকদিন, শব্দহীন, যাকে মৃত্যু বলে ;
অবশ্য বিষয় নয়—বিপণনে বন্ধ্যা তাই বিবেক ছোঁবে না কোনও ছলে।

কিছু শব্দ লিখব বলে আমি ছাদে উঠে এসে দেখি
কালো বৃষ্টি জমছে আকাশে।

যুদ্ধ, না শান্তি

কতটা রক্ত দিলে কতখানি জয়
এইসব কেউ কেউ মেপে নিতে পারে;
যারা তা পারে না তারা জলের কিনারে
প্রেমিক বা প্রেমিকায় খুঁজে নেয় ক্ষয়।

মানুষ শান্তিই চায় এই মন্ত্রে যারা যুদ্ধ করে
তাদের চতুর রক্ত ফুটে ওঠে খবর-কাগজে;
যখন পারে না আর তখনই অগত্যায় মজে
মানবিক ও আণবিক শান্তি চায়, আগে কিংবা পরে।

যারা অন্ধ-বন্ধ তারা ছুটে যায় বধ্যভূমিতে
কেউ কারও ছেলে কেউ স্বামী কিংবা কেউ কারও ভাই
যে যেমন পারে মরে; আমরা যে তাহাদেরই চাই—
মানুয দুভাবে মরে ; কেউ বেঁচে, কেউ মৃত্যু জিতে।

যুদ্ধ না শান্তি—এই বিমূর্তেই চলে বেচাকেনা
যার পুঁজি যত ভারী তারই কাছে পরিশোধ্য দেনা।

গাভাসকার

(ব্যাঙ্গালোর, ১৯৮৭, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে
দ্বিতীয় ইনিংস মনে রেখে)

কখনো এমন হয়
একজন
শুধু একজনই
একার নৈঃসঙ্গ থেকে হয়ে ওঠে
অসংখ্যের স্নায়ু সম্মিলন।
চারিদিকে ভীষণ গর্জন
যেন বা সমুদ্র চায় ঝড়ের সুযোগে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে কিনে নিতে
তার ত্যক্ত বাকি একভাগও—
যাতে মানুষের শেষ কবচকুণ্ডলি
উৎখাতে বিপন্ন হয়ে
শুধুই শোকের মতো রেখে যায় ধ্বনি
একার আকাশে।

তবু সূর্য অন্ধকার মেনে নিয়ে
ফিরে যেতে যেতে
রক্তাক্ত পশ্চিম থেকে পুনরায় ফিরে আসে
দ্বিপ্রাহরিক পরিচয়ে
ঔজ্জ্বল্যে শাণিত হয়ে
যাতে আলো পড়ে সেই নির্বিকল্প
অনন্যের মুখে।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা থেকে কর্ণের মহিমা
অর্জুনের একাগ্রতা নিয়ে
দ্যাখে সেই একই মুখ
শৌর্যে শ্রমে প্রতীক্ষায় একার বিদ্রোহে
ক্রমশ হচ্ছে দৃঢ়—
দেখাতে মানুষই পারে যুদ্ধের প্রস্থান থেকে
ছড়াতে নিজের ছায়া রণক্ষেত্র জুড়ে,

বাঘের থাবায় কিংবা সাপের ছোবলে ছিন্ন
বধ্যভূমি থেকে
চিনে নিতে জয়।
অসম্ভব তবুও সম্ভব
বহুর পতন থেকে ডেকে আনা
একার বিজয়—
বিজিতের, এমনকি জয়ীর বুকেও।

অচলায়তন

দ্যাখো, এখনও কেমন
গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন চেয়ারে!

কিছুদিন আগেও যে-ফোঁড়াটা
টনটন করত সব সময়
শরীরের চাপ সামলাতে না পেরে
সেটা ফেটে গেছে হঠাৎ।
উট চেনবার আগেই
বালিতে মুখ গুঁজেছে
ঘাড়ের কুঁজ,
চোখে ছানি পড়লেও
অভাব হচ্ছে না দূরদর্শিতার।

এক দু'বছরের মধ্যেই যারা
জীবনী লিখবে
তাদের অনেককেই
জবাব দিয়েছে ডাক্তার।
এখন একটাই চিন্তা :
নতুন প্রজন্ম কোথায়?

দেখতে দেখতেই এসে পড়ে
নতুন প্রজন্ম—
তাদের পিছনে রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফার।

বাবু বলেন, শুধু মুখের ছবি তুললেই হবে—
পোজ দেবে তো এরা।

রিপোর্টার জিজ্ঞেস করে,
অনেক তো হলো—
এখনও চেয়ার আটকে রেখেছেন কেন?
ফ্রেমে-বাঁধানো জবাব থেকে

তৃতীয়টি তুলে নেন বাবু,
হাসতে হাসতেই বলেন,
আমি চেয়ার আটকে রেখেছি,
না চেয়ার আমাকে—
সেটা ভেবে দেখো।

রিপোর্টার জিজ্ঞেস করে,
আপনার এতগুলি ছেলেমেয়ে—
এদের কারও মুখেই
আপনার আদল নেই কেন?

বাবু বলেন, এমনই তো হবে।
গান শোনোনি—
বিবিধের মাঝে দ্যাখো মিলন মহান!
আমার বয়সে পৌঁছে
এরা ঠিক পেয়ে যাবে আমার আদল!
তবে কি না স্বাধীনতার
পঞ্চাশ বছর পরেও
জন্ম নিচ্ছে নিত্য নতুন রোগ—
কত সম্ভাবনাই যে ঝরে যাচ্ছে অকালে!

শেষ প্রশ্ন : তাহলে আপনার সিক্রেট কি?

বাবু বললেন, সিক্রেট আমি নিজে।
ফাঁস করলেই তো ঝাঁপিয়ে পড়বে
পাকিস্তান কিংবা চীন!
জানো তো, আমাদের নিরাপত্তা
খুবই দুর্বল!

ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে
রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফার—
বসে পড়ে মাটিতে,
তারপর শুয়েও পড়ে।
এবং শুনতে পায়
অচলায়তনের ভিতর থেকে
হাই তুলছেন বাবু—
এখন তাদেরও ঘুমোবার সময়।

নিজের সঙ্গে দেখা

এখনও ওঠেনি ঝড়
যে-কোনো সময়
উঠবে বলেই মনে হয়।

সেই অপেক্ষায়
শুয়ে সাত সমুদ্রের ধারে।
সকলে পারে না সইতে,
কেউ কেউ পারে।

পাতানো ভূমিকা ছেড়ে
যারা চলে যায়
তারা আর ফেরে না কখনো ;
বন্ধুরা সমস্ত জানে, এই দর্শনও।

ঘাস শুকিয়ে খড়
ঘাম শুকিয়ে নুন ;
একার নিরুত্তাপ সেঁকছে আগুন।

ঠিক জেনো এই অন্তর্জলি
নিজেরই সঙ্গে দেখা। চলি।

স্মৃতির মতন কিছু

তার কোনো চেহারা থাকে না।
কিন্তু নিশ্চিত তাকে দেখা যায়
একা কিংবা নিজের ভিতর—
যেন জলরঙ ছবি, যেন কেউ এঁকে ফের মুছে দিয়েছিল,
প্রদর্শশালার ভিড়ে উপেক্ষিত হারিয়ে ঘরানা।

তবু যে চিনতে চায় তাকে তার স্বপ্নই চেনায়।
সে আসে ও ফিরে যায়,
সময় হয়েছে কিনা জেনে নেয় আড়ে,
অন্য জাগতিক থেকে শব্দের নৈঃশব্দ্য ভেঙে পায় নির্দেশ—
জল ছিঁড়ে আসে জল,
হঠাৎ প্লাবনে ভাসে শিশুকাল, যৌবনকাল—
এখনও জীবিত স্মৃতি—
অন্তত এবার ওকে যেতে দাও সেতুর ওপারে।

স্বপ্নের ভিতর তুমি নিজেই চিনেছ সেই ছবি :
প্রদর্শশালা জুড়ে একটিই ছবি আর দর্শকও শুধু একজন
হৃত তার চোখমুখে রূপ রস গন্ধ আর স্পর্শ ও ধ্বনির
স্মৃতির মতন কিছু, স্মৃতি নয়, বিমূর্ত কবিতা—

যে যায় একাই যায়, এইভাবে, ঠিক এইভাবে।

লোকটা

প্রতিবাদ করতে করতে যে-লোকটা ছুটে গেল
সে জানে না
সততাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে
সাহসকে কলাবউ সাজিয়ে
অঙ্গে চন্দন মেখে
হাসছে তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

তারা জানে কী বেআক্কেলে আর গোঁয়ার
ওই লোকটা—
অঙ্কটা না শিখেই নেমে পড়েছে
হিসেব মেটানোর খেলায়!
আর খেলতে খেলতে ক্রমশ খসে পড়ছে
তার চুল, চোখ, দৃষ্টি
টলমল করছে হাড়পাঁজরা আর
ফুসফুসের অস্বস্তি থেকে
ক্রমশ সরে যাচ্ছে
পায়ের তলার মাটি।

বেআক্কেলে আর কাকে বলে!

অথচ অঙ্কটা শিখলেই লোকটা বুঝতে পারত
মন্ত্রীর পাশের চেয়ারটা রাখা ছিল
তারই জন্য
দু লাখ থেকে দু কোটিতে পৌঁছনো
কোনো ব্যাপারই ছিল না
মূকের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারলেই
পেতে পারত পুরস্কারের মুখোশ—
স্প্রিংয়ের বিছানায় নতুন বউ।

অসুখ

তেমন কোনো অন্ধকার তেমন কোনো আলো
ছিল না সেই অনিশ্চয়ে ; শুধুই খুব দূরে
কে যেন একা একার গান গাইছিল ভুল সুরে—
কে সে! কার বিরহ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকালো!

একটি শালিখ উড়তে গিয়েও নামল আবার মাঠে :
ওষুধগন্ধে এখন সকাল, নাকি যাবার বেলা?
যে-হাত এসে ফোটালো ছুঁচ, তারই হেলাফেলা
চেনালো মনিটরের রেখায় অনন্তকাল কাটে।

এক্কাদোক্কা

এক্কাদোক্কা খেলতে খেলতে শরীর গেল ভিজে—
কাঁদতে দেখে মা বলল, মেয়েটা তুই কী যে!
এমন তো হয় সক্কলেরই— সব মেয়েরই হয়,
এখন থেকে ছেলে জুটিয়ে এক্কাদোক্কা নয়।
রাখবে মনে এই কথাটা ডাগর হয়ে গেলে—
ছেলেগুলো সব খুবলে খাবে একলা একা পেলে।
একটা ছেলে থাকবে কোথাও সময় হলে খুঁজো,
যে তোমাকে বউ বানাবে তাকেই কোরো পুজো।

মেয়েটা কেমন পাল্টে গেল শুকিয়ে চোখমুখ,
বুকের মধ্যে অসংখ্য ভয় কাঁপিয়ে দিল সুখ।
হঠাৎ কেন বউ হবে সে, পুজো করবে কাকে—
কেনই বা সে ফেলবে ছুড়ে খেলার পুতুলটাকে!
কেন অমল ডাকতে এলে ভর দুক্কুরবেলা
দূরটি থেকেই বলতে হবে, বন্ধ আমার খেলা—
এখন থেকে থাকব শুধুই নিজের পাহারায় ;
নিজেই নিজের বন্দি আমার শরীর থাকার দায়!

জীবনানন্দের সেই বই

ওই ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে যুবকটি।
গতির শব্দ তুলে এইমাত্র যে-ট্রামটি চলে গেল
তার ঝঙ্কার এখনও ছুঁয়ে আছে তাকে,
সম্ভাবনা থেকে অসাড় নিজেকে তুলে
হাতের মোড়কটি ছুঁয়ে দেখছে সে-
দূরতর দ্বীপের চেয়েও দূরে তাকানো তার দৃষ্টি
এখনও চেনে না কখন আসবে সেই মুহূর্ত যখন
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে—
কিংবা হবে না কিছু, কিছুই হবে না।

তারপর সেখানে এসে দাঁড়ায় সেই যুবতী।
পরস্পরকে এড়িয়ে যাওয়া তাদের চোখ তখন
অভিজ্ঞতা ছুঁয়েও সন্দেহ করছে পরস্পরকে ;
নৈকট্য ও দূরত্বের মাঝখানে এই গোধূলিসন্ধি
জীবন কিংবা মৃত্যু যে-কোনো হাতেই রাখতে পারে হাত।

তবু, যুবতী জানে, ওই মোড়কেই আছে
জীবনানন্দের সেই বই
যা পড়তে পড়তে একদিন তারা
শুরু করেছিল নিজেদের—
যুবক জানে, সম্ভাবনা কখনো কখনো এইভাবেই
ঠেকিয়ে রাখে মৃত্যুকে।

ঘুমের পরেও থাকে

ঘুমের পরেও থাকে সন্তানের জন্য কিছু শোক
এমন আবহমান ন্যূব্জ হয়ে দেখি তার
জন্মের রঙিনে রাঙা স্বপ্নময় আভা
ক্রমশ বিচিত্র শব্দে জাগরুক কথা আর আহ্লাদিত ভাষা
তখন শৈশব ছিল তখনও অচেনা ক্ষোভে
সে স্তব্ধতা ভাঙেনি পুকুরে।
বয়স যাকে যা দেয় কেড়ে নেয় তার চেয়েও বেশি
কিছু তার বাস্তবিক কিছু যেন মুহূর্তে রচিত
জলস্তম্ভের মতো সমুদ্র আড়াল করে রাখে।

ঘুমের মধ্যে ঘুম আমি নিশিডাক শুনে
আজও ছুটে যাই অন্ধকারে
দেখি বিপরীত থেকে মুঠোভরা ঝিনুক কুড়িয়ে
সেও ঠিক ছুটে আসে—এইটুকু, শুধু এইটুকু,
আমার শরীর রোজ বুড়ো হয় শোকের স্বভাবে।

স্বাধীন কণ্ঠ

স্বাধীন কণ্ঠ, তোমার সঙ্গে ভাব হয়েছিল ভালবাসা হলো
পক্ষীরাজই মানাতো তোমায় তবু তুমি পায়ে হেঁটেই এসেছ
চোখের আগুনে আভাসিত মুখ দেখতে দেখতে জল এল চোখে
ব্যর্থতা ছিল নিগ্রহ ছিল তবুও এমন কাঁদিনি কখনো!

স্বাধীন কণ্ঠ, কতদিন পরে জেগে ওঠা হাতে দেখালে আকাশ
আমি শিরা চিনি রক্ত কেমন চেনায় আগুন দেখেছি শিরায়
শীতকাতরতা ছেড়েছে মানুষ অগণন তারা ভাঙছে শেকল
যত মত তত পথ পিষে পায়ে শুধুই খুঁজছে মুক্তি মুক্তি!

স্বাধীন কণ্ঠ, এ সবই স্বপ্ন হারতে হারতে এটুকুই আছে
তবু মাঝরাতে ভেঙে যায় ঘুম বুঝি এ আদ্যিকালের তামাশা
স্বপ্নেই জাগে স্বপ্নেই মরে স্বপ্নও প্রায় মরে খানখান
অন্ধতা ছুঁয়ে হাঁটি লাঠি ঠুকে তোমাকে সত্যি শুনব কখনো!

চিনি না অনেক দৃশ্য

চিনি না অনেক দৃশ্য। স্মৃতি যাকে সহ্য করে তার
মধ্যে শুধু দেখা যায় নদীর নিঃশ্বাস নয়
জলকাটা মোটরবোটের
জয়ের মতন শব্দ। পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে
শেখা হলো সারাক্ষণ
কীভাবে নিজেকে আরও দুর্ভেদ্য করে রাখা যায়।

আজ তবু চারিদিকে প্রকৃতি উপমা।

চৌরঙ্গির ভিড়ে এসে ডাক দেয় স্বচ্ছজল নদী
বইয়ের পাতার মধ্যে ঢুকে পড়ে অদেখা পাহাড়
যাকে ছুঁয়ে দেখি তার শরীরে গাছের গন্ধ আর
যে-পাখিটি বসে ছিল সে যেন সহসা উড়ে গেছে,
হঠাৎ সূর্যের মতো চোখ ঝলসিয়ে দেয়
বোতামের আলো।

অসুখে বিষাদে

প্রত্যেক বুকেই আছে একটা-দুটো অচেনা অসুখ ,
শরতে হলুদ রোদ যেমন হঠাৎ হয় মেঘে-মেঘে গাঢ় সম্ভাবনা
তেমনই আকস্মিক, ধরা পড়ে কিংবা পড়ে না—
তবু সঙ্গে সঙ্গে যায়, পাশে বসে ছায়ার মতন
কিংবা টিটকারি দেয় তোমার দীর্ঘশ্বাসে ছিটিয়ে বমন—
যতই চাও না কেন চেনাবে না শোক।

প্রত্যেক মুখেই আছে একটা-দুটো অদেখা বিষাদ ;
যেন বা ত্বকের নীচে অন্য ত্বক, সমুদ্র শোষণ হলে
তারও নীচে লতাগুল্মময়
অদৃশ্য মাছের মতো, আছে কিংবা নেই এই স্বপ্ন ছুঁয়ে
জেগে ওঠে ঘুমে—
কখনো দেয় না ধরা, শুধু সম্ভাবনা থেকে মুখ তুলে
হঠাৎ চিনিয়ে দেয় অন্ধকার চোখ।

আমার অসুখ

রোদ্দুরে বিষাদ মিশে ঘন করে আমার অসুখ।
সারবে না জেনেও যারা স্তোক দিয়েছিল ভালো হবে
তারা কবে এসেছিল, কবে যে হঠাৎ চলে গেল
কিছুই জানি না ; শুধু টের পাই ওই উৎসবে
আমার নিমন্ত্রণ সঙ্ঘের নিয়মে গেছে বাদ।

জানালায় আগল নেই, আরও নীচে মৃত্যুময় খাদ।
শূন্য চোখ চেয়ে থাকে যেখানে অদেখা
আকাশ দিগন্ত অব্দি ছুঁয়ে আছে রোদ
আমার বয়সী চিল শৈশবের স্মৃতি ছুঁয়ে
ভেসে আছে এখনো হেলায়
সে কি মৃত্যু চেনে? জানে মৃত্যুরও আড়ালে কত ছল?

আমি চিনে নিই সব রঙের বদল।
কখন দুপুর হলো হঠাৎ বিকেল এসে
বলে গেল সন্ধেবেলায়
তোমার একান্ত রক্ত ভাষা পাবে, খুঁজে নেবে বোধ
জাগো, জেগে থেকে জানো শুধুই এমন বাঁচা
খুব কোনো সার্থকতা নয়।

যারা উৎসবে জড়ো তাদের পরিশ্রম
আলো হয়ে ওঠে অন্ধকারে—
একে-একে পর-পর ক্রমশ হাউই সব
ছাই করে একে অন্যাকে।

শতাব্দী শেষের রাত

দারিদ্র্যের পূজা করো, তার দাবি সকলের আগে।
হিসেব রাখেনি তবু নিজগুণে নিজেকে ছাড়িয়ে
শতাব্দী শেষের রাতে এখনো সে একা-একা জাগে
কলকাতা ও অন্যখানে, যেখানে জীবন বহু দূর—
যেখানে আকাশ আছে, ছাদ নেই, দু হাত বাড়িয়ে
স্পর্শ করা যায় শূন্য আর ক্ষুধা, জরা, মৃত্যু, যম।

আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এক পায়ে বেঁধেছে ঘুঙুর
অবাক ন্যাংটো মেয়ে যার কোনো উপলক্ষ নেই—
জন্মচিহ্ন রেখে যাওয়া সম্ভাবনা ছিল না কখনো
সহস্রাব্দে পৌঁছে যে দেখাবে ভবিষ্যৎ, আলো, উপশম
দারিদ্র্যে শীতল এই জাগতিক মানচিত্র জুড়ে।

বিশ্ববঙ্গ করবে বলে রঙ্গে ভরা এক টন বাঙালি
তড়িঘড়ি ছুটে এসে সভা করল তাজ বেঙ্গলে ;
শিল্প থেকে আর্সেনিক দূষণ সমস্তই আলোচ্য বিষয়—
বঙ্গীয় ভাষণ হলো ইংরেজিতে, পড়ল হাততালি,
প্রশ্নের উত্তরে বলল অনভ্যাসে ইংরেজিই খোলে।

বাহা-বা বিশ্ববঙ্গ, যুবভারতীতে জমে হিন্দি নাচাগানা।
তাজের অনেক দাম, কয়েক লক্ষ টাকা খরচের জয়
দেদার প্রচার পেল ; ক্ষুধা ও আর্সেনিকে জীবনের ক্ষয়
যারা চিনে গেছে তারা বঙ্গভুমে বাংলায় দোলে—
টিভি ও কাগজ থেকে জেনে নিল ভিনগ্রহ থেকে এক টন
যারা এসেছিল তারা এ বঙ্গ ভাণ্ডারেরই বিবিধ রতন ,
কেউ ইনি, কেউ তিনি, কেউ বা শুধুই রামগরুড়ের ছানা।

বাড়ির সামনে এসে

বাড়ির সামনে এসে কেন এত ভয় পাও তুমি?
প্রশ্ন থাকে না, তবু প্রশ্নেই ছিরকুট মন
চেনো না মায়ের হাত, স্ত্রী ও সন্তানের ক্ষণ—
এতটা রক্তাক্ত, তবু হারিয়ে ফেলেছ বাসভূমি!

ভাবছ তোমার সঙ্গে কবে কার কথা হয়েছিল,
কার ছুরি বেঁধা পিঠে, বন্ধুতায় ছিন্ন আঙুল
মনে কি পড়ে না! স্মৃতি কেন হয় সমস্তই ভুল!
তবে কি বিশ্বাসই সব দরজায় খিল এঁটে দিল!

বাড়ির সামনে এসে ফিরে যাবে, বাড়িও মানুষ
এই ভেবে যত খোঁজো বাড়ির ভিতর বাড়ি, দেখায়নি মুখ-
কখনো দেয়নি ধরা এই জন্ম আত্মীয়তা এতটা অসুখ!
অন্ধ তোমার ভয় কাকে ছুঁয়ে চেনাবে তোমাকে!

এতগুলো বোকার মধ্যে

এতগুলো বোকার মধ্যে একটি লোকই চালাক,
সে ঠিক জানে কোন কাঠিটা ঢাকের উপযুক্ত ;
আওয়াজ পেলেই কে যায় বাজার, কে রাঁধতে চায় সুক্তো-
এরাই থাকুক, নাচুক-কুদুক ; বোদ্ধারা সব পালাক।

ওই লোকেরই মর্জি বুঝে দর্জি ডাকে সবাই—
মেয়ে পুরুষের সমান ছাতি, দৈর্ঘ এবং প্রস্থ,
এদিক ওদিক হবার ভয়ে দর্জিও মদস্থ ;
গোপন হুকুম : ফিট না হলে হবে বামাল জবাই।

হরেক খেলার মধ্যে এমন কেউ দ্যাখেনি আগে ;
হ্যামোলিনের বাঁশির সুরে হাম-তুম হাম-তুম,
যে যার গলায় বেসুরো গায়, দম ফুরোলেই ঘুম—
ঘুমের ওষুধ খেয়ে সবাই ওরই কোলে জাগে।

অসিতবাবুকে চেনা যেত নীলাম নীলাম-এ,
তখন বিকেল-এ আর আকরিক-এ—
চেখভ থেকে উঠে আসা প্রজ্ঞায় ;
কিংবা সেইসব নাটকে
যা আমি দেখিনি বা যে সব নাটক
একা অন্ধকারে জেগে উঠত তাঁর চিন্তায় ও স্বপ্নে :
কোনো দিন মঞ্চস্থ হবার সম্ভাবনায়
তাঁকে করে তুলত আলাদা থেকে আরো আলাদা
সমুদ্রের ওপর দিয়ে দূর থেকে দূরে যাওয়া
সিগালের মতো।

কে জানত তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হবে ওই
যা-হোক কিছু সম্ভাবনার মধ্যে!
সেই ড্রিপ-ড্রিপ আচ্ছন্নতায়
যেখানে জীবন কিংবা মৃত্যু জুয়া খেলে
পরস্পরের সঙ্গে ;
আই. সি. ইউ. বলতে আর কী বোঝায়!
নিঃশ্বাস সহ্য করতে পারে না এতদূর
অপক্ষপাতের চাপ
রোদ্দুর না অন্ধকার, কিছুই আর পরিচিত নয়—
কখন ভিজিটিং আওয়ার্স শুরু হবে জানতে চাইলে
নার্স জানিয়ে দেয় তখন রাত দুটো।

আমি পাঁচ নম্বরে, তিনি কত'য়?
জানি না। শুধু কণ্ঠস্বর অনুমান করতে করতে শুনি :
ঘুমিয়ে থাকুন, এখন অনেক রাত—
যাদের আপনি খুঁজছেন তারা সকলেই আছে
সকলেই দেখে গেছে আপনাকে

কাল যখন ওরা আসবে তখন আপনি অনেকটা ভালো
চিনতে পারবেন সকলকে।

কে জানত দু'দিন পরে আমি যখন যাচ্ছি উডবার্ন ওয়ার্ডে
আরোগ্যের দিকে
তার একটু আগেই তিনি রওনা হয়ে গেছেন
অন্য দিকে....

যতিচিহ্ন

যতিচিহ্ন হয়তো সকলেরই
ভালো লাগে।
আমারও তা লেগেছিল ভালো
সেই সন ঊনচল্লিশে।

অসংখ্য বছর পরে আজ
মনে হয় ইক্ষ্বাকু সমাজ
এখনও অলব্ধ হয়ে আছে
ক্লেদে রণে শিথিল বিশ্বাসে।

আজও দরকার একবার
ক্লোমে মিশমিশে অন্ধকার,
চোখেমুখে শাখার প্রবাহ
যতিচিহ্ন শুরুতে ও শেষে।

অবিশ্বাস

ছুঁড়েছে পাথর, তবু
কবিতা কি পুরনো হয়েছে
তোমার মুখের চেয়ে ?

রক্তই তো চেয়েছিলে—
তবু কেন তোমার দু-চোখে
এত অবিশ্বাস !

কেন উঠছে না হাত
পুনরায় পাথর কুড়োতে ?

অনুবাদ :

জাপানি কবিতা

ইয়ামামুরা বোচো

একক

গোধূলি বেলার
আকাশ,
এবং আমার অতীত—
তার দুঃখ ;

আকাশে
অসংখ্য পৃথিবীতে পথ করে
পাখিরা চলে গেছে—
জানে না কেউ কোথায়

হাঙ্গিওয়ারা সাকুতারো

ডাকঘরের জানালায়

ডাকঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে
বাড়িতে চিঠি লিখি।
অবস্থাটা ঝোড়ো কাকের মতো, মুমূর্ষু
জুতো এবং ভাগ্য দুটোই ছেঁড়া।
আকাশটা ধূসর
এবং আজও আমি বেকার।

বাবা, আমাকে বলো
জীবনের আর কী বাকি।
ছেঁড়া ঝুলির সামর্থ্য গুনি
নেতিবাচক দুঃখের চিন্তায় ;
পয়সাগুলো যেন আমারই জীবনের টুক্‌রো,
ছুড়ে দিই ফুটপাথের উপর।
হায়রে আমার শহর,
হায়রে আমার বুড়ো বাপ!

আমি সোজা চলে যাব সমুদ্রে—
বিষাদের পথে হেঁটে যাব জেটি পর্যন্ত,
বাতাসের মতো ঘুরতে-ঘুরতে।
হে জীবন!
আমি বাঁশির শব্দ শুনছি
একটি জাহাজ এবার সমুদ্রে যাবে।

সাতো হারুও

একটি ইচ্ছা

লক্ষ্যহীন, অর্থহীন,
স্বল্পায়ু—
কিন্তু সত্য।
একটি অসাধারণ সত্য কবিতা—
যদি এইসব দিনে
মাত্র সেইরকম একটি লিখতে পারতুম!
এখন জানি ঈশ্বর কী চেয়েছিলেন
মেঘ সৃষ্টির আগে।

ঘুমপাড়ানি গান
আমার মা যা গাইতেন এক সময়—
তাও যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়ে আনতে পারতুম!
কিন্তু মুহূর্তের আবেগে গাওয়া সেই গান—
মা অনেকদিনই ভুলে গেছেন।

আমার জীবদ্দশায়,
একবারও যদি লিখতে পারতুম
বাতাসের মতো এক গান, স্ফূর্ত ও প্রাঞ্জল,
তবুও গেঁথে যেত মানুষের অন্তরে,
বাহ্যিক সবকিছুই হারিয়ে যেত হঠাৎ,
আর বেঁচে থাকত মানুষের সঙ্গে সঙ্গে—
যদি লিখতে পারতুম সেই রকম একটি!

হোরিগুচি দাইগাকু

শিয়াল

আঙুর বনে
একটি শিয়াল
এবং একটি নেকড়ে তোমার
জানালায়!

কণ্ঠহার

বাসনা আমার
অশ্রু ফোঁটায় একটি তারে
তোমার জন্যে
বাঁধতে পারি
কণ্ঠহার।

সাইজো ইয়াসো

কেউ

বাতায়নের পাশ দিয়ে কেউ যায়
বলতে বলতে : "আঁধার, শুধু আঁধার।"

(অবাক হলাম সমস্ত ঘর আলো
এমন কী ওই বাহিরেতেও আলো)

কিন্তু ঘরের পাশ দিয়ে কেউ যায়
বলতে বলতে, "আঁধার, বড়ো আঁধার।"

ফুকাও সুমাকো

দান্তের সমাধি

দান্তের সমাধির সম্মুখে, যেখানে সূর্য তার আবহমান কিরণ বিলায়, আমি প্রার্থনা করেছি যথার্থ মানবিক হবার—আর, যদি তা পূরণ হয়, তাহলে আমি আর চাইব না কবি হতে।

দান্তে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন এক রূপালি চাবুক—সেই বিখ্যাত অস্ত্র, প্রচণ্ডতম ঘৃণার আদর্শ, যে-ঘৃণার নিষ্ঠুর কশাঘাতে নিজের পিতৃভূমিকে আঘাত হানতে-হানতে তাঁর হাত-ব্যথা হয়েছিল। আমি নাড়িয়ে দিয়েছিলুম, ভারবাহী খচ্চরের জন্য কখনো একে ব্যবহার করব না এই প্রতিজ্ঞায়—হঠাৎ আমি দৃঢ় হয়েছিলুম।

অনেক পবিত্র পাতা জড়ো হয়েছিল দান্তের বাগানে, আর তাদের কাঁটায় বিদ্ধ আমার সম্বল ছিল তীব্র অনুভূতি। নবজন্মে দীক্ষিত এক রমণীর মতো দর্শকের খাতায় সই দিয়েছিলুম, তোমার অনুগত পরিচারিকা—ফুকাও সুমাকো।

মিকি রোফু

বৃষ্টির গান

[অংশ]

বৃষ্টিপাতের শব্দ
শান্ত হৃদয়ে
আমার হৃদয়ের খুব কাছে বৃষ্টির শব্দ।
শব্দটা শুনতে শুনতে,
বৃষ্টির শব্দে,
যেন আমার প্রিয়তমার দীর্ঘশ্বাস
তার ঝুঁকে-পড়া ললাট আমার বুকে।

আর যখন ঝির্‌ঝিরে
যেন টুক্‌রো যন্ত্রণা ;
আবার নতুন জোর এলে,
যেন আকণ্ঠ বিষাদ।

আহা, এখনো ঝরে পড়ছে বিষাদের সুর,
হৃদয় উথলে উঠছে তীব্র আকাঙ্ক্ষায়।
রাতের বৃষ্টির দীর্ঘশ্বাস
হৃদয়ে স্বপ্নের মতন...

মারুইয়ামা কাওরু

দূর থেকে স্কুলের দৃশ্য

স্কুল ছাড়ার পর থেকে দশটি বছর শুধুই ঘুরেছি
পিছনে তাকালে বহুদূর স্মৃতির মাঝে দেখতে পাই
উজ্জ্বল পদকে খচিত স্বস্তির মতো স্কুলটি :
টালির ছাদ, ক্লাসঘর—
একজন শিক্ষক বলে যাচ্ছেন।
অনেক অরুণ মুখ, নির্নিমেষ মগ্ন চোখে শুনছে তাঁকে ;
কিন্তু জানালার পাশে কে যেন অন্যমনস্ক,
আমারই মতো, অমূর্ত চোখে এদিকে তাকিয়ে—
সে কি এখনো আমাকে দেখেনি?
হায়, এখান থেকে আমি যে তাকে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি..

কিতাগাওয়া ফুয়ুহিকো

উৎসব

আশ্চর্য বলতে হবে
আমার পছন্দ
উৎসবশেষের মুহূর্ত।

উৎসবের মাঝে
মানুষের ভিড়ে
কদাচ নিজেকে হারাই।
আমি খুঁজি—
আমি শুধুই খুঁজে ফিরি।

কিন্তু উৎসব শেষ হলে
যখন সমস্ত মানুষ ছত্রখান,
জড়িয়ে পড়ার মধ্যে
আবিষ্কার করি নিজেকে
আনন্দিত সবাই যখন উদ্দেশ্যবিহীন,
অবাক হয়ে
নিজেকে দেখি।

আবার,
আশ্চর্য বলতে হবে,
আমি পছন্দ করি
একটি উৎসব গড়ে তুলতে।

কুশানো শিম্‌পেই

ব্যাঙের আত্মকাহিনী

আমার জন্ম বোলোগনার আশেপাশে,
এক পদ্মপুকুরে।
তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে, আকাশে লাথি ছুঁড়ে—
পুচ্ছহীন চারপেয়ে পাখির দৃশ্য
বিস্ময় বয়ে আনত আমার কাছে।
আমার নাম কোয়েরক্—
নামটি, অবশ্যই, নিজের দেওয়া।
একদিন ধরা পড়লুম জালে,
সোজা চলে এলুম এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ;
সঠিক বলতে হয়, গ্যালভানি ল্যাবোরেটারিতে।
কয়েকজন ছাত্র (যতদূর জানি)
হেঁটে গেল, ভেনিসীয় গানের গুঞ্জন তুলে—
১৭৮০-র সেই বিকেলে,
ধারালো এক ছুরি চলে গেল আমার উদর বিদ্ধ করে,
বিশ্ব বুঝে নিল বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎস।

আমি মরে গেলুম,
আমি চলে এলুম পৃথিবীর বাইরে—
ইতালির স্বর্গ সুন্দর, অতি সুন্দর।

ব্যাঙ

তোমার স্বপ্ন
দিগন্ত-ছোঁয়া চূড়ার থেকেও দূর ;
তোমার পিঠ
স্বর্গের ফাঁদ...

(হ্যাঁ, তা সত্যি)

তাকামি জুন

স্বর্গ

স্বর্গ কোথায় শুরু?
কালো ঘুড়িটা যেখানে ওড়ে
সেইখানে কি স্বর্গ?

লোকচক্ষুর বাহিরে
এখানে
একটি ফল ধীরে ধীরে পেকে উঠছে,
আহা, তার চারপাশে ইতিমধ্যেই নেমে এসেছে স্বর্গ।